ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৬ সংখ্যা ১ বৈশাখ ১৪০৪

অল্পবয়সে গর্ভধারণের ফলাফল

ফজিলাতুন নেসা

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় এগারো কোটি এবং এর শতকরা ১২ ভাগই ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স্ক নারী। বাংলাদেশের জন-উর্বরতা জরীপে (Bangladesh Fertility Survey) প্রাপ্ত ১৫-১৮ বছরের নারীদের বয়সানুপাতিক বিবাহের হার ছকে দেখানো হলো:

বয়স	বিবাহিতা নারী (শতাংশ)
১৫	২৩.০
১৬	৩৯.০
১৭	৫১.০
১৮	৬৩.০

এদের মধ্যে শতকরা ২০ জন ১৫ বছর বয়স পার না হতেই প্রথম সন্তানের মা হয়ে থাকেন, শতকরা ৬৬ ভাগ মা হন ১৮ বছর বয়সে এবং ৮৮ ভাগ হয়ে থাকেন ২০ বছরের আগে (Selected Statistical Series, 1992)। ১৯৯১ সনের বাংলাদেশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগ্রহীতা জরীপ (Bangladesh Contraceptive Prevalence Survey, 1991) অনুসারে দেখা যায়, ২০ বছর বয়স্কা মহিলাদের ৬০ শতাংশ গর্ভবতী কিংবা এক সন্তানের মা। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো অল্পবয়সে বিয়ে হওয়া। অল্পবয়সে বিয়ে এবং প্রথম গর্ভধারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অল্পবয়সে গর্ভধারণের জটিলতা

অল্পবয়সে গর্ভধারণের জটিলতার ফলে মা ও নবজাতকের মৃত্যু এবং রোগগ্রস্ততার হার খুব বেশি। মহিলাদের শারীরিক এবং মানসিক পরিপূর্ণতার অভাবে অল্পবয়সে গর্ভসঞ্চার এবং মা হওয়ার কারণে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বিশোর্ধ্ব বয়সী মায়েদের সন্তানের তুলনায় অনূর্ধ্ব ২০ বছর বয়সী মায়েদের গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি। এ প্রসঙ্গে ৩৬টি দেশে পরিচালিত জরীপের (Demographic and Health Survey এবং World Fertility Survey) উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেসব মহিলা ১৮ বছর বয়সের আগে গর্ভবতী হন, তাঁদের নবজাত শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি ২০-২৪ বছর বয়সে যারা মা হন তাঁদের চেয়ে ৪৬ ভাগ

(৩য় পাতায় দেখুন)

যৌন প্রদাহ

ডাঃ আবু ইউসুফ

ক্লেমাইডিয়া ট্রেকোমাইটিস

সুপ্তিকাল: ৭ থেকে ১৪ দিন। অনেক সময় ৩-৪ সপ্তাহ হতে পারে।

লক্ষণ ও উপসর্গ

ক্লেমাইডিয়াল যৌন প্রদাহের প্রাথমিক লক্ষণ পুরুষদের মধ্যে মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্রনালীতে চুলকানি ও প্রস্রাবের সময় জ্বালা-পোড়া।

মেয়েদের মধ্যে জরায়ুর মুখে তরল পুঁজালো প্রদাহ: এই রোগ গণোরিয়া থেকে আলাদা করে দেখা খুবই দুরূহ, কারণ লক্ষণ ও উপসর্গ প্রায় একরকম। পুরুষদের মধ্যে এ-রোগের সম্ভাব্য জটিলতা হলো: অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং সন্তান না-হওয়া। পুরুষ সমকামীদের মধ্যে গুহ্যদ্বার এবং রেকটামে প্রদাহ হবে। চোখে প্রদাহ, গিটে-গিটে ব্যথা এই কয়েকটা প্রদাহ একসাথে থাকলে এটাকে বলে রেইটার্স সিন্ড্রোম।

মেয়েদের মধ্যে জরায়ুর মুখে প্রদাহ, ঘন ঘন পুঁজালো প্রদাহ, যৌনাঙ্গ ফুলে যাওয়া (এরিথেমা) ও শেষের দিকে রক্তভরা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। এই সংক্রমণের জটিলতা হলো: সালপিনজাইটিস, বন্ধ্যাত্ব এবং অনেক সময় ফেলোপিয়ান টিউবে গর্ভধারণ (একটোপিক প্রেগনেন্সী) গর্ভাবস্থায় এ-রোগ হলে নবজাতক শিশুর নিউমোনিয়া ও চোখে প্রদাহ।

রোগ নিরূপণ

ক্লেমাইডিয়া এবং গণোরিয়ার জীবাণু সাধারণত একই সঙ্গে সংক্রমিত হয়। গণোরিয়ার সফল চিকিৎসার পরেও যখন মূত্রনালীর প্রদাহ চলতে থাকে তখনই ক্লেমাইডিয়াজনিত প্রদাহ সন্দেহ করা হয়। ক্লেমাইডিয়াল প্রদাহকে নিশ্চিত করার জন্য মূত্রনালী অথবা সারভিক্স থেকে শ্লেষ্মা নিয়ে সেল কালচার বা আরো বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন।

কেমন করে ছড়ায়

একমাত্র যৌন সংগমের মাধ্যমে এ-রোগ হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল ৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন।
ডক্সিসাইক্লিন ক্যাপসুল ১০০ মি.গ্রা. ১২ ঘন্টা পর পর ৭ দিন।

গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের জন্য: গর্ভবতী মহিলা — ক্যাপসুল এরিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন।
শিশুদের জন্য— ক্যাপসুল এরিথ্রোমাইসিন ২৫০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন।

ট্রাইকোমনিয়াসিস

এই সংক্রামক জীবাণু এককোষবিশিষ্ট প্রটোজোয়া ট্রাইকোমোনাস ভেজাইনালিস

সুপ্তিকাল: ৪ থেকে ২০ দিন। সাধারণত এক সপ্তাহ।

লক্ষণ

মেয়েদের যোনিদ্বার দিয়ে ভেতর থেকে সাদা স্রাব বের হওয়া যাকে ইংরেজিতে লিকোরিয়া এবং বাংলায় শ্বেত প্রদর বলে।
রোগের লক্ষণ: এটি দীর্ঘস্থায়ী এমন একটি ব্যাধি যা সচরাচর দেখা যায়। এ-রোগের বিশেষত্ব হলো: মেয়েদের যৌনাঙ্গেই এ-রোগ সবচেয়ে বেশি হয়।

এ-রোগে যোনিপথে প্রদাহ এবং রক্তাক্ত ঘা হয় যা থেকে ফেনা-ফেনা, তরল হলদে রঙের ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হয়।

পুরুষদের মধ্যে সাধারণত এ-রোগের জীবাণু প্রস্টেট, মূত্রনালী ও মূত্রনালীর দুই পাশে অবস্থিত সেমিনেল ভেসিকেলে থেকে যায়, কিন্তু কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায় না। ধারণা করা হয় যে, শতকরা তিন ভাগ মূত্রনালীর প্রদাহ এই জীবাণু দ্বারা হয়। এই জীবাণু পুরুষদের মধ্যে প্রস্টেটের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

কেমন করে ছড়ায়

একমাত্র যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে এ-রোগ হয়ে থাকে।
অনেক সময় দূষিত কাপড়-চোপড় থেকেও এ-রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

পরীক্ষাগারে রোগ নিরূপণ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সচল লেজযুক্ত প্যারাসাইট সনাক্ত করা। আরও ভালো হয় যদি প্রদাহ-নিঃসৃত রস কালচার করা যায়।

চিকিৎসা

মেট্রোনিডাযল ৪০০ মি.গ্রা. বড়ি ৮ ঘন্টা পর পর ৭ দিন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এক সঙ্গে সেবন করতে হবে। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় এবং চিকিৎসার পর পর যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থাকতে হবে। যোনিপথের ঘা শুকাবার জন্য গর্ভবতী মহিলাদেরকে যোনিপথের ভিতরে মেট্রোনিডাযল ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট ১ মাসে ৪টি বড়ি অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ১টি বড়ি ব্যবহার করতে হবে।

সেঙ্করয়েড (Chancroid) বা পিছলি-পচা

পিছলি-পচা জীবাণু — হিমোফাইলাস ডুক্রি
সুপ্তিকাল: ৩ থেকে ৫ দিন — ২ সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে।
রোগ নিরূপণ: হিমোফাইলাস ডুক্রিকে এক ধরনের বিশেষ কা মিডিয়াতে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের জন্য বের করা যায়। শরীরে অংশ থেকে প্রদাহের কারণে রস বের হচ্ছে তা কালচার করতে হবে।
কিভাবে সংক্রামিত হয়: একমাত্র যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে এ-রোগ থাকে।

যেসব প্রদাহ এবং পচনশীল গ্রন্থি থেকে রস বেরুচ্ছে যৌনসঙ্গমকালে পচনশীল রসের সংস্পর্শে আসাই হলো এ-রোগের প্রধান কা যৌনসঙ্গম ছাড়াও এ-রোগ মাঝে মাঝে হতে পারে। যত্রতত্র যৌনসঙ্গম অপরিচ্ছন্নতাও এ-রোগের সংক্রমণে সহায়তা করে।

রোগের লক্ষণ

পিছলি-পচা একটি খুবই তীব্র সংক্রামক ব্যাধি যা সাধারণত যৌনাঙ্গ যৌনাঙ্গ সংলগ্ন শরীরের অংশে এবং গ্রন্থিতে সীমাবদ্ধ থাকে। এ-রো বিশেষত্ব হলো যৌনাঙ্গের সংক্রমিত অংশে একটা কিংবা বেশ কয়ে অংশে পচনশীল ঘা দেখা দেবে যা সাধারণত যৌনাঙ্গের আশেপাশের (Lymphmode) গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা ফুলে গিয়ে ব্যথা হতে পারে এবং পচনশীল প্রদাহে গ্রন্থিটি পুঁজে ভরে যেতে পা শরীরের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থিতেও এ ধরনের ঘা হতে পারে।

এ-রোগ সবচেয়ে বেশি হয় নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে (Tropical) পুরুষদের মধ্যে। পুরুষরাই এ-রোগের আধার।

চিকিৎসা

সেফট্রায়াক্সন ইঞ্জেকশন ১ গ্রা. মাংসপেশীতে দিনে ১ বার মোট ১০ দি অথবা এরিথ্রোমাইসিন ক্যাপসুল ৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পর পর মোট দিন অথবা সিপ্রফ্লোক্সাসিন ট্যাবলেট ২৫০ মি.গ্রা. ১২ ঘন্টা পর পর ১০ দিন নিতে হবে।

শরীরের যেসমস্ত গ্রন্থি পুঁজের প্রভাবে ফুলে আছে এবং যে-কোনো মুহূ ফেটে যেতে পারে, সেই গ্রন্থিগুলোকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুঁজগুলি বে করে ফেলতে হবে।

সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

ট্রাইকোমনিয়াসিস: যৌনসঙ্গমের সময় সংক্রমিত ব্যক্তির যোনি-পথের ও মূত্রনালীর নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে আসলেই এ-রোগ হয়। অনেক সময় এ জীবাণু দ্বারা দূষিত কাপড়-চোপড় পরলে এ-রোগ হতে পারে। ডোবা, খাল কিংবা পুকুরের ময়লা পানিতে গোসল

"সেঙ্করয়েডের ঘা"

করলে এ-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষভাবে মেয়েদের মধ্যে অনে বেশি।

পিছলি-ফোলা/পিছলি-পচা: যৌনসঙ্গমের সময় ফেটে-যাওয়া আক্রা গ্রন্থির সংস্পর্শে আসলে এ-রোগ হয়। এছাড়াও যদি ফেটে-যাওয়া গ্রন্থি রস কারো শরীরে লাগে বিশেষ করে কেটে-যাওয়া কাঁচা ঘায়ে কিংবা মুখে ভেতরের আবরণের সংস্পর্শে আসলে এ-রোগ হতে পারে।

কেন্দ্রের বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন
সংলাপ রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (ICDDR,B)-এর ষষ্ঠ বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন (ASCON VI) অনুষ্ঠিত হলো গত ৮ ও ৯ মার্চ। কেন্দ্রের সাসাকাওয়া আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এ.কে. আজাদ চৌধুরী। কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর ডেমিসি হ্বতে'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকাস্থ UNAIDS-এর প্রতিনিধি ডঃ লিসা মেসারস্মিথ এবং ওডিএ-প্রতিনিধি ডঃ মেহতাবুন্নিসা কারী এবং সম্মেলনের আহবায়ক আইসিডিডিআরবি-এর ডঃ সারা হক্‌স্ বক্তব্য রাখেন। এ-বছরের প্রতিপাদ্য ছিলো "প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ (Reproductive Tract Infections and Sexually Transmitted Infections) সম্মেলনে ৫২টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও ৩০টি পোস্টার উপস্থাপন করা হয় এবং দেশ বিদেশের ২২৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

যৌনরোগসমূহের সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

সাধারণত নিম্নোক্ত প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সবরকম যৌনব্যাধির জন্য প্রযোজ্য :

১. জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও স্কুল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিয়ে এ-সত্যকে বুঝতে হবে যে, যত্রতত্র যৌনসঙ্গম, ঔষধ গ্রহণ, বিভিন্ন লোকের জন্য একই সুঁচ ও একই সিরিঞ্জ ব্যবহার এইড্‌স ও অন্যান্য যৌনব্যাধির সহজেই সংক্রমণ ঘটায়।

২. অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে যৌনসঙ্গমকালে (বিশেষ করে যাদের সংস্পর্শে যৌনব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যেমন পতিতা ও কলগার্ল) কনডম ব্যবহার করা উচিত।

৩. সাধারণ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও যৌন-স্বাস্থ্যের ওপর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যৌনরোগসমূহের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪. জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, বিশেষ করে যাদের মধ্যে যৌনব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাদেরকে ডাক্তার বা স্বাস্থ্য ও সমাজকর্মীদের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে যেন যত্রতত্র যৌনসঙ্গম, অবৈধ যৌনসঙ্গম, বিশেষ করে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত একেবারেই পরিহার করেন, কারণ নিষিদ্ধ পল্লীকে বিভিন্ন যৌনব্যাধির জীবাণুর সামাজিক আধার হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

৫. সত্বর রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ করার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সমাজের সবাইকে যৌনব্যাধিসমূহের লক্ষণ ও কেমন করে এসব রোগ ছড়ায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হবে।

৬. কিশোর-কিশোরীসহ জনগণকে স্বাস্থ্যজ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন যে, অবাধ যৌনসম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ। একাধিক যৌনসঙ্গী, পতিতালয়ে গমন এবং বিকৃত যৌনসম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনো ধরনের যৌনসম্পর্ক না থাকাই উত্তম।

৭. কোনোরকম যৌনরোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

অল্পবয়সে গর্ভধারণ

(১ম পাতার পর)

বেশি (Hobcraft, 1992) । বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সে যেসব মহিলা সন্তান প্রসব করেন তাঁদের শিশুদের জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যুর (Neonatal Mortality) ঝুঁকির হার ১৮-২০ বছরের ভেতর যেসব মহিলা সন্তান প্রসব করেন তাঁদের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ বেশি।

এক বছরের কম-বয়সী শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি যেসব মহিলা ১৮ বছরের পরে গর্ভবতী হন তাঁদের তুলনায় ৬০ ভাগ বেশি। এক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, ১৮-২৩ বছর বয়স্কা মহিলাদের গর্ভপাতের হার শতকরা ৯.৭ ভাগ, এবং অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স্কাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪.৩ ভাগ। ২০ বছর বয়সের আগে যেসব মা গর্ভধারণ করেন, সেসব মায়েদের মৃত্যুর হারও বেশি। ১৯৯১ সনে জনৈক জনসংখ্যাবিদ উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের মতলবে ১৮ বছরের কম-বয়স্কা এবং ২০-২৪ বছর বয়স্কা মায়েদের মৃত্যুর অনুপাত ছিলো যথাক্রমে শতকরা ৭.৪ ভাগ ও ৪.১ ভাগ। মাতৃমৃত্যুর হার পরবর্তী গর্ভের চেয়ে প্রথম গর্ভের বেলায় বেশি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মা ১৮ বছরের আগে প্রথম সন্তান প্রসব করেন।

জটিলতার কারণসমূহ

এ-কথা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে, অল্পবয়সে গর্ভধারণ মা এবং শিশুর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে ১৮ বছরের নিচে গর্ভধারণ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কেননা এ-বয়সে গর্ভধারিণী তার দৈহিক ও মানসিক পূর্ণতা অর্জন করে না এবং এর ফলে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতার মধ্যে রক্তশূন্যতা, গর্ভপাত, ভ্রূণের মৃত্যু, অকাল জন্ম, বাধাপ্রাপ্ত (Obstructed) প্রসব উল্লেখযোগ্য। এসব প্রধান সমস্যাগুলোর উদ্ভবের জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী, যেমন : সামাজিক কুসংস্কার, অল্পবয়সে বিয়ের জন্য সামাজিক ও পরিবারিক চাপ, অল্পবয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। কাজেই দেরিতে বিয়ে, দেরিতে গর্ভধারণ, যথাযথ গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নববিবাহিতা দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে এসব জটিলতা অধিকাংশই কমিয়ে আনা সম্ভব। অল্পবয়সে গর্ভধারণ এবং তরুণীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করার প্রধান কারণগুলো হলো : প্রচলিত সামাজিক প্রথায় তরুণীদের অবাধ চলাচলে বাধা, শিক্ষার অভাব, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিনিময়ের অভাব, শ্বশুর-শাশুড়ীদের নাতি-নাতনি দেখার সখ, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে নারীদের মতামতের প্রতি অবহেলা, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা, নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাব এবং সমাজে তাঁদের স্বল্প মর্যাদা।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যসম্মত প্রজনন বহুলাংশে নির্ভর করে বিয়ে এবং প্রথম গর্ভধারণের সময়ে মহিলাদের বয়স, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার এবং যথাযথ গর্ভকালীন পরিচর্যার ওপর।

নবজাতকের মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যু রোধের একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক হচ্ছে মায়ের শিক্ষা। শিক্ষা নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করে, তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে, শৈশবকালীন রোগ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং সেসব অসুস্থতা বুঝার ও সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা বাড়ায়।

বাংলাদেশে মেয়েদের মাসিক স্রাব (Menarche) শুরু হওয়ার আগে বা অব্যবহিত পরেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তারা নিজেরা মা হওয়ার আগে স্বাধীনভাবে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনযাপনের কোনো অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে

পারে না। আমাদের সমাজে এখনো এ-বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বিয়ের পরপরই একজন মেয়েকে গর্ভবতী বা সন্তানের জন্ম দিতে হবে — যাতে প্রমাণিত হয় মেয়েটি বন্ধ্যা নয় এবং তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে বিয়ের পরপরই মহিলারা সন্তান পেতে চায়। আবার, সন্তানের জন্মদান বিয়েকে টেকসই করার হাতিয়ারও বটে। বাংলাদেশে এ সমস্ত সামাজিক রীতিনীতিই অল্পবয়সে গর্ভধারণের জন্য দায়ী।

নবজাতকের মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার বেশি পরিলক্ষিত হয় ১৮ বছর বয়স-সীমার নারীদের ক্ষেত্রে। এসব মৃত্যু রোধ করা সম্ভব উন্নততর সেবাদান কার্যক্রম এবং তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলা কোনো প্রকার গর্ভকালীন পরিচর্যা পান না; গর্ভকালীন সময়ে কোনো রকম পরীক্ষাও করা হয় না। প্রসব করানো হয় এমন ব্যক্তির সাহায্যে যার কোনো প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণহীন ধাত্রীরা নিরাপদ প্রসব করানোর কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিধিসম্মত প্রসব সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা জানে না, প্রসবকালীন জটিলতায় কী কী করণীয়। ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা বা শিশুর বেড়ে-ওঠা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই বললেই চলে।

কী কী করণীয়

পরিবার কল্যাণ এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সেবাদানের গুণগত মান উন্নয়ন এবং ধাত্রীদের মা ও শিশু পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করে গর্ভবতী মা ও নির্দিষ্ট সময়ের আগে যেসব শিশুর জন্ম হয় তাদের মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করতে পারে। মহিলা মাঠকর্মীদেরকে (পরিবার কল্যাণ সহকারী) মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো যেতে পারে। মাঠকর্মীদের দ্বারা গর্ভবতী মহিলাদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সনাক্তকরণ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, শিশু-পরিচর্যা ও হাসপাতালে প্রেরণ-সংক্রান্ত সেবাদানের মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন। কিশোরীদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত শিক্ষাদান কর্মসূচি ও নববিবাহিতাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার মাধ্যমে গর্ভপাতের হার কমানো যেতে পারে। কিভাবে মা ও শিশুর জীবনের ঝুঁকি কমানো যায়, সে-বিষয়ে স্বামী ও শাশুড়ীদের জ্ঞান ও শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে মূল্য সংযোজন ঃ প্রাথমিক তথ্য

রুমানা আক্তার সাইফী

জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্য জনসংখ্যা সমস্যা-পীড়িত বাংলাদেশকে আশার আলো দেখিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ১৯৭৯ সালে পদ্ধতিগ্রহীতার হার যেখানে ছিল মাত্র ১৩% ভাগ সেখানে ১৯৯৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪৫% ভাগে। জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে এতদিন পর্যন্ত পদ্ধতিসমূহ বাড়ি-বাড়ি বিনামূল্যে গ্রহীতার কাছে সরবরাহ করা হত, কিন্তু গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমগ্র কর্মসূচির ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার সকলের দোরগোড়ায় পদ্ধতিসমূহ পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর শ্রমশক্তির প্রয়োজন। এসব ব্যয়ের সিংহভাগই (৬০% ভাগ) আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। তাই সুদূরপ্রসারী ফলাফলের জন্য আমাদের এখনই নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। এ-কথা মনে রেখেই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সম্প্রতি মূল্য সংযোজন সংক্রান্ত একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য : কর্মসূচিতে মোট ব্যয়ের কিছু অংশ গ্রহীতার কাছ থেকে তুলে আনা এবং ধীরে ধীরে গ্রহীতারা যেন নিজেরাই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ কিনে নেন তা নিশ্চিত করা। একই সাথে মনে রাখতে হবে যে, আগামী দিনগুলিতে দাতা দেশগুলি থেকে এই খাতে একই পরিমাণে সাহায্য আসবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। মোট কথা কর্মসূচির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং সকলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলাই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। মূল্য সংযোজন উদ্যোগের আওতাধীন এলাকায় এখন থেকে নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী মূল্য আদায় করা হচ্ছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূল্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

গ্রহীতার বাড়ি		**স্যাটেলাইট ক্লিনিক**	
খাবার বড়ি :	১ টাকা / চক্র	খাবার বড়ি :	৫০ পয়সা / চক্র
কনডম :	১ টাকা / ডজন	কনডম :	৫০ পয়সা / ডজন
ইনজেকশন :	২ টাকা / ডোজ	ইনজেকশন :	১ টাকা / ডোজ

পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এফ.ডব্লিউ.সি)

এখানে সকল পদ্ধতি বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

পরীক্ষামূলকভাবে এই মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় আইসিডিডিআর,বি-র এমসিএইচ-এফপি সম্প্রসারণ প্রকল্প (রুরাল) চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার ধুম ইউনিয়ন এবং যশোর জেলার অভয়নগর থানার রাজঘাট ইউনিয়নকে বেছে নিয়েছে। পরীক্ষামূলক এ-উদ্যোগের জন্য একইভাবে আইসিডিডিআর,বি-র কারিগরি সহযোগিতায় FPMD-এর তদারকিতে যশোর জেলার চৌগাছা থানার সুখপুকুরিয়া ইউনিয়ন এবং কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার কাশীনগর ইউনিয়নে পরিবার পরিকল্পনায় মূল্য সংযোজন আরম্ভ হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বর্তমানে গ্রহীতাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য ইউনিয়নগুলি থেকেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উদ্যোগ শুরু করার আগে FWV-গণ গ্রহীতাদের কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করলে অধিকাংশ গ্রহীতাই ইতিবাচক সাড়া দেয়। এই ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা গ্রহীতারাও চিন্তা করছেন। দিনের পর দিন এসব পদ্ধতি যে বিনামূল্যে পাওয়া আর সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে সবাই ওয়াকিবহাল। তাই ভাবনাহীন সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে এখন থেকেই

(৭ম পাতায় দেখুন)

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

কোনো কোনো এলাকায় ম্যালেরিয়া একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যসমস্যা এবং রোগীর মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ম্যালেরিয়া এক বিশেষ ধরনের জ্বর — যা প্লাসমোডিয়াম নামক এক ধরনের প্যারাসাইট বা পরজীবী দ্বারা সংক্রমিত হয়। প্লাসমোডিয়াম প্রথমে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে ও পরে তা যকৃত বা লিভারে জমা হয়। এক থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে এর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়; রক্তের মাধ্যমে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং লোহিত রক্তকণিকার দেয়াল ভেদ করে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেখানে আবার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে লোহিতকণিকার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে। এসময় রোগীর প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভূত হয় এবং পরে জ্বর আসে। প্লাসমোডিয়াম এভাবে নতুন নতুন লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করতে থাকে ও সংখ্যায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি আক্রমণের ফলে রোগী দুর্বল হতে থাকে এবং চিকিৎসা না পেলে কখনো মৃত্যুবরণ করে। যদি বেঁচেও থাকে তবে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে অন্য রোগে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মশার কামড় ব্যতীত একমাত্র রক্ত-সঞ্চালন ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে না। মশাই এই জীবাণুকে বহন করে নিয়ে যায়। আমাদের আশেপাশে অনেক প্রকার মশা আছে। তার মধ্যে স্ত্রীজাতীয় এ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করে বা ছড়ায়। যখন মশা কোনো ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত রোগীকে কামড়ায়, তখন এই মশা নিজে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। পরে এই মশা সুস্থ মানুষকে কামড়ালে সেও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়।

মশার আচরণ ও বংশবিস্তার

মশা সাধারণত পানিতে, বিশেষত নোংরা পানিতে বা লবণাক্ত পানিতে ডিম পাড়ে। তবে তা অবশ্যই স্থির পানি হতে হবে, যেমন : পচা ডোবা, নালা, বিল, নর্দমা, বদ্ধ জলাশয়, অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে স্থান, পরিত্যক্ত কুয়া, জঙ্গল ইত্যাদি। এই ডিম কয়েক ধাপে পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত হয়। একগুচ্ছ ডিম থেকে প্রায় সমান সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী মশা জন্ম নেয়। এই সময় মশার শরীরে কোনো জীবাণু থাকে না এবং মানুষকে কামড়ালেও ম্যালেরিয়া হয় না। তবে ডিম তৈরির জন্য মশাকে রক্ত পান করতে হয় এবং সে-কারণেই মানুষকে কামড়ায়। প্রথমে মশা তার লালা-গ্রন্থি থেকে মানুষের রক্তে লালা ঢেলে দেয় এবং রক্ত পান করে। যদি ঐ ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত থাকে তবে মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু চলে আসে। সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী জীবাণু মিলিত হয়ে ম্যালেরিয়ার নতুন জীবাণু তৈরি করে; ১০/১৫ দিনে বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং লালা-গ্রন্থিতে এসে জমা হয়। যখন এই মশা পুনরায় কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন তার রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে।

যেসব মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে তারা সাধারণত সন্ধ্যার পর বা মধ্যরাতে কামড়ায়।

ম্যালেরিয়ার প্রকার ও প্রকোপ

বন-জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকায় ম্যালেরিয়া বেশি হতে দেখা যায়, কারণ এসব স্থানে মশার বিস্তার রোধ করা দুরূহ এবং যারা কাজ করতে আসে তারা কেউ সাধারণত মশারী ব্যবহার করে না। পার্শ্ববর্তী দেশে যদি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তাহলে সীমান্ত এলাকাতে এই রোগ বেশি হতে পারে।

সাধারণত ৪ ধরনের জীবাণু দ্বারা মানুষের ম্যালেরিয়া হয় : প্লাসমোডিয়াম ভাইভেক্স, প্লাসমোডিয়াম ফেলসিপেরাম, প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি এবং প্লাসমোডিয়াম ওভেল। আমাদের দেশে প্লাসমোডিয়াম ভাইভেক্স ও প্লাসমোডিয়াম ফেলসিপেরামই বেশি দেখা যায়। তবে ফেলসিপেরামের কারণে যে-ম্যালেরিয়া হয় তা সাধারণত মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে। তাকে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া বলা হয়।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ

* হঠাৎ শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং রোগীর খুব শীত লাগে, সঙ্গে কাঁপুনি থাকে।
* ২/৩ ঘন্টার মধ্যে ঘাম-দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।
* ২/৩ দিন পর পর রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে; কিছুক্ষণ জ্বর থাকে আবার ঘাম-দিয়ে ছেড়ে যায় এবং জ্বর ছাড়ার পর রোগীকে সুস্থ মনে হয়।
* এসময় রোগীর ডায়রিয়া হতে পারে।
* জ্বর বেশি দিন থাকলে লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে যায়।

রোগীকে কখন হাসপাতালে পাঠাতে হবে

* ম্যালেরিয়ার ঔষধ খাওয়ানোর পর রোগী ৩ দিনের মধ্যে ভালো না হলে।
* রোগীর খুব বেশি বমি বা পাতলা পায়খানা হলে।
* রোগী ভুল বকতে থাকলে এবং রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে।
* রোগী মুখে কিছু খেতে না পারলে।
* রোগী জ্ঞান হারালে।
* রোগীর খিচুনি হলে।

ক্ষতিকর দিক

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে লোহিতকণিকা ভেঙে যাওয়ার ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে; যকৃত ও প্লীহা আক্রমণ করে এবং এর কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে রোগীকে ক্রমে দুর্বল করে ফেলে; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে ও এক সময়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। জীবাণু যখন মস্তিষ্ক আক্রমণ করে তখন রোগী ভুল বকতে থাকে ও ক্রমে অজ্ঞান হয়ে যায়। ম্যালেরিয়া রোগীর বার বার ডায়রিয়া এবং বমিও হতে পারে এবং ক্রমে পানিশূন্যতা দেখা দেয় এবং পরে অপুষ্টিতে ভোগে। গর্ভবতী মায়েদের ম্যালেরিয়ার কারণে গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে বা স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট শিশু প্রসব করার সম্ভাবনা থাকে।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ও রোগীর যত্ন

* ম্যালেরিয়া জ্বর বুঝা গেলে রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ক্লোরোকুইন বড়ি বা সিরাপ খাওয়াতে হবে।
* ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খাওয়াতে হবে (কমপক্ষে ৩ দিন)।
* রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে ও স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে।
* জ্বর খুব বেশি হলে ঠান্ডা পানিতে কাপড় ভিজিয়ে গা মুছে দিতে হবে।
* প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করে রোগীকে এমন ঘরে রাখতে হবে।
* রোগীকে মশারীর নিচে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
* ম্যালেরিয়ার কারণে শিশুর জ্বর হয়েছে সন্দেহ হলেই শিশুকে পূর্ণমাত্রায় ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করাতে হবে। একদিনও দেরি করা

চলবে না। কোন্ চিকিৎসা উত্তম এবং কতদিন চলবে এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে।

* গর্ভবতী মাকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে এবং সেবা-যত্ন করতে হবে; নতুবা শিশুর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

গর্ভবতী মায়েদের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি

গর্ভবতী মহিলাদের ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দ্বিগুণ বেশি। গর্ভকালীন সময়ে এই রোগ অধিকতর মারাত্মক। ম্যালেরিয়া হলে গর্ভবতী মহিলা মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে এবং গর্ভপাত হতে পারে, অপরিণত অথবা মৃত সন্তান প্রসব করতে পারে। চিকিৎসার ব্যাপারে অবশ্যই খুব সাবধান হতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ মতো ঔষধ খাওয়াতে হবে। যে-এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়, সেখানে প্রত্যেক মহিলাকেই ডাক্তারের পরামর্শ মতো ম্যালেরিয়া হওয়ার আগেই স্বল্পমাত্রায় প্রতিষেধক খাওয়ানো উচিত।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা (সাধারণ ডোজ)

ছক ১ : ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট (১৫০ মি.গ্রা.)

দিন	বয়স				
	১ বছরের নিচে	১-৩ বছর	৪-৬ বছর	৭-১১ বছর	১১ বছরের বেশি
প্রথম দিন	১/২	১	১ ১/২	১ ১/২	৪
দ্বিতীয় দিন	১/২	১	১ ১/২	১ ১/২	৪
তৃতীয় দিন	১/২	১/২	১/২	১	২

ছক ২ : সিরাপ ক্লোরোকুইন (৫০ এমএল)

দিন	বয়স	
	১ বছরের কম	১-৩ বছর পর্যন্ত
প্রথম দিন	১ ১/২ চা-চামচ ৭.৫ এমএল মোট	৩ চা-চামচ ১৫ এমএল মোট
দ্বিতীয় দিন	১ ১/২ চা-চামচ ৭.৫ এমএল মোট	৩ চা-চামচ ১৫ এমএল মোট
তৃতীয় দিন	১ চা-চামচ ৫ এমএল মোট	১ চা-চামচ ৫ এমএল মোট

অষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

রোগীর বমি-বমি ভাব কিংবা বমি হতে পারে। মাথা ঘুরাতে পারে। কানে ভন-ভন শব্দ হতে পারে। সাময়িকভাবে দেখতে অসুবিধা হতে পারে বা মাথা ব্যথা হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, অষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ম্যালেরিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব অনেক বেশি মারাত্মক।

পূর্ণমাত্রায় অষুধ খাওয়ার গুরুত্ব

যে-কোনো অষুধের সম্পূর্ণ মাত্রা (ডোজ) শেষ করা উচিত। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় অষুধ না খেলে অসুখ ভালো হবে না এবং এই অষুধে পরবর্তী সময়ে কাজ হবে না এবং উচ্চ-মাত্রার অষুধ খাওয়াতে হবে। উচ্চ-মাত্রার অষুধ খাওয়ালে অনেক ঝুঁকি থাকে এবং আর্থিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। তাই পূর্ণমাত্রায় অষুধ খেলে রোগ সেরে যাবে এবং পরে কখনো ম্যালেরিয়া হলে এই একই অষুধে কাজ হবে।

রোগীর খাবার (পথ্য)

- রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়াতে হবে
- প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে
- কোনো খাবার বন্ধ করার দরকার নেই
- রোগীর জ্বর ভালো হলেও রোগীকে বাড়তি খাবার দিতে হবে
- ভালো হওয়ার পরও শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের প্রচুর পরিমাণে পানীয় ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

কিভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যায়

- সকলকে নিয়মিত মশারীর মধ্যে ঘুমাতে হবে (বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু ও গর্ভবতী মাকে) — অর্থাৎ মশার কামড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে
- মশারী না থাকলে কয়েল ব্যবহার করতে পারেন
- ম্যালেরিয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করতে হবে
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ম্যালেরিয়ার পূর্ণ চিকিৎসা করাতে হবে।

বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়, ডোবা-নালা, মজা-পুকুর, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে — অর্থাৎ মশার জন্ম হতে পারে এমন সব জলাশয় বন্ধ করার মাধ্যমে মশার শূক-কীটের জন্ম রোধ করে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে হবে।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা

- ম্যালেরিয়া রোগীকে খুঁজে বের করা
- রক্ত-স্লাইড সংগ্রহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা
- ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা
- ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা
- মশা নিধনের/নিয়ন্ত্রণের সরকারী কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা
- মশারীতে অষুধ দিয়ে চুবানোর কর্মসূচি (Bed Net Imprégnation Programme) বাস্তবায়ন করা
- ম্যালেরিয়ার মহামারী দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্রতিমাসে ম্যালেরিয়া রোগীর প্রতিবেদন/রিপোর্ট থানা কার্যালয়ে প্রদান করা।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকল্পে গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা

- গ্রামবাসীকে ম্যালেরিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা
- ম্যালেরিয়া রোগীর সংবাদ সরকারী স্বাস্থ্যকর্মীকে জানানো
- সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করা।

সূত্র :

- *স্বাস্থ্যসেবার রেফারেন্স ম্যানুয়েল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*
- *বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক পাপুয়া নিউগিনির ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রের ধারাভাষ্য থেকে অংশ বিশেষ*
- *Insect and Rodent Control through Environmental Management : A Community Action Programme, published by WHO in collaboration with UNEP.*

মূল্য সংযোজন

(৪র্থ পাতার পর)

মূল্য প্রদানের ব্যাপারে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এই উদ্যোগকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করতে নানা রকম বাস্তবধর্মী মতামত দিয়েছেন। তাঁদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়নের ঘরে-ঘরে যখন ছোট ছোট হ্যান্ডবিল আকারে মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ার বার্তা পাঠানো হয়েছে, তখন গ্রহীতারা বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেননি। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে। এসব খন্ড-খন্ড ঘটনা প্রমাণ করে যে, গ্রামবাসীরা সবাই ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন। তবে একথাও সত্যি যে, প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহীতাদের মনে মূল্যবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে সংশয় ছিল। মূল্য আদায়ে সরকারের সম্মতি আছে কি না, এ বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রচারের ফলে কিছু ব্যতিক্রমসহ গ্রহীতাদের সংশয় দূর করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, মূল্য দিতে অপরারগ অনেক দম্পতি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে পদ্ধতি গ্রহণের আশা ব্যক্ত করেছেন। তবে সত্যিই তারা উক্ত স্থান থেকে পদ্ধতি গ্রহণ করছেন কি না এ ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খোলা বাজারে পদ্ধতিগুলি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নামমাত্র মূল্য আরোপ অবশ্যই প্রশংসনীয়। এই চারটি ইউনিয়নে মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়া সফল হলে আশা করা যায় সমগ্র বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের ফলাফল পরিবার পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। পরিশেষে একথা বলা আবশ্যক: সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারীর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক এই উদ্যোগকে সফল করতে সাহায্য করবে। এছাড়া আমরা যদি সেবার মান নিশ্চিত করতে পারি তবে গ্রহীতারা মূল্য প্রদানে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করবে।

স্বাস্থ্য কুইজ — ১৯

১. একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক কতটুকু প্রোটিন খাওয়া উচিত?
২. ভাইরাস কী? মানবদেহে ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট পাঁচটি রোগের নাম লিখুন।
৩. দেহে শর্করার অভাবে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়?
৪. যেকোনো ধরনের নলকূপ থেকে কাঁচা ল্যাট্রিনের দূরত্ব কত হওয়া উচিত?
৫. কোয়াশিওরকর কী?

[প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের কাছে ১৫ই জুলাই ১৯৯৭ তারিখের আগে পৌঁছাতে হবে]

স্বাস্থ্য কুইজ — ১৮ এর উত্তর

১. শিশুর পাতলা পায়খানা যদি স্বাভাবিক না হয়ে গুরুতর হয় এবং তিন দিনের মধ্যে অবস্থার কোনো উন্নতি না ঘটে তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সাহায্য নিতে হবে।

নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিলে বাবা-মা দেরি না করে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিবেন:

* শিশু খুব দুর্বল হলে * স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করলে * চোখ বসে গেলে * বেশি জ্বর থাকলে * প্রচন্ড পিপাসা পেলে * মলে রক্ত দেখা গেলে * বার বার বমি হলে * ঘন ঘন বা অধিক পরিমাণে পাতলা পায়খানা করলে।

২. অন্যদের চেয়ে গর্ভবতী মহিলাদের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দ্বিগুণ। গর্ভকালীন সময়ে এই রোগ অধিকতর মারাত্মক। ম্যালেরিয়া হলে গর্ভবতী মহিলা মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে এবং গর্ভপাত হতে পারে, অপরিণত অথবা মৃত সন্তান প্রসব করতে পারে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মায়েদের ওজনে কম ও দুর্বল শিশু প্রসবের সম্ভাবনা থাকে। এসব শিশু সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
৩. গর্ভবতী মহিলার যে-পাঁচটি লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসা-সাহায্য প্রয়োজন:

   * গর্ভধারণের সময়ে প্রসবপথে রক্তপাত হওয়া * তীব্র মাথা ব্যথা (উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ) * অবিরাম বমি * প্রচন্ড জ্বর * খিঁচুনি।
৪. গর্ভকালীন সময়ে বা প্রসবোত্তর সময়ে ৪২ দিনের মধ্যে কোনো কারণে যদি মায়ের মৃত্যু ঘটে, সেই মৃত্যুর সংখ্যাকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোট জীবিত শিশুর জন্মের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এক হাজার (১,০০০) দিয়ে গুণ করলে যে হার পাওয়া যাবে তাকে মাতৃমৃত্যুর হার বলে।

   বাংলাদেশে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪.৫ (সূত্র: বিবিএস-১৯৯৬)
৫. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এলাকার মোট গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যাকে ঐ সময় ও এলাকার মোট সক্ষম দম্পতি দিয়ে ভাগ করে একশত দিয়ে গুণ করলে যে হার পাওয়া যাবে তাকে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বলে।

(স্বাস্থ্য কুইজ — ১৮ এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

শ্বেত প্রদর

(৮ম পাতার পর)

হবে। লিকোরিয়া সাধারণত ধীরে ধীরে শুরু হয়, কিন্তু হঠাৎ করে অতিরিক্ত স্রাব শুরু হলে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ (গণোরিয়া, ক্লামাইডিয়া, ইত্যাদি) ও যৌনাঙ্গে কোনো রাসায়নিক পদার্থ (যেমন সেভলন-পানি) প্রয়োগের কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রজননতন্ত্র পরীক্ষার সময়ে যদি জরায়ুর মুখ থেকে স্বাভাবিক সাদা রঙের দুর্গন্ধহীন এবং পুঁজহীন স্রাব নির্গত হতে দেখা যায় তাহলে লিকোরিয়া হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। স্রাবের স্বাভাবিক মাইক্রোসকোপিক পরীক্ষাও অনেক সময় লিকোরিয়া নির্ণয়ে সহায়তা করে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

লিকোরিয়া যে-কারণেই হোক না কেন, এর চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে একটু ভিন্নতর — অর্থাৎ কোনো ঔষধের সাহায্যে এর চিকিৎসা করা হয় না। কেবলমাত্র রোগিনীকে পুনঃপুনঃ সুপরামর্শ ও বুঝানোর মাধ্যমে এ-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

পরামর্শগুলো নিচে দেয়া হল:

- রোগিনীকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, লিকোরিয়া কোনো মারাত্মক সমস্যা নয় কিংবা এ থেকে অন্য কোনো মারাত্মক অসুখ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনা-আপনিই সেরে যায়।
- যে-কারণে লিকোরিয়া দেখা দিয়েছে তা পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেয়া।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- অহেতুক আট-শাঁট আন্ডারওয়ার ব্যবহার না করা এবং সেভলন-পানি জাতীয় তরল পদার্থ দিয়ে যোনিপথে "ডুচ" দেওয়া বা ধোয়া উচিত নয়।
- অন্য কোনো অসুখ থাকলে তাড়াতাড়ি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

শ্বেত প্রদর

ডাঃ কানিজ গাওসিয়া

শ্বেত প্রদর বা লিকোরিয়া ও এর কারণসমূহ

লিকোরিয়া একটি ইংরেজি শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে শ্বেত প্রদর। সহজ ভাষায় একে বলা যায় অতিরিক্ত প্রদাহসম্পন্ন সাদা স্রাব। গ্রামাঞ্চলে এর নানাবিধ নাম আছে। কেউ 'খিচ-ভাংগা' বা 'খিচ' যাওয়া বলে অভিহিত করেন। অনেকে আবার 'ধাতু-ভাংগা'ও বলে থাকেন। সাধারণ মহিলারা, এমনকি অনেক গ্রাম্য স্বাস্থ্যকর্মীও মনে করেন অতিরিক্ত সাদা স্রাব নির্গত হওয়ার কারণে শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, মাথা ঘোরায়, হাত-পা জ্বালা-পোড়া করে ও স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়।

লিকোরিয়া বা অতিরিক্ত সাদা স্রাব মহিলাদের একটি সমস্যা। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ডিম্বনালী, জরায়ু ও যোনিপথ থেকে প্রতিনিয়তই কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই তরল পদার্থকেই বলা হয় সাদা স্রাব। এই সাদা স্রাব শব্দটার আগে যখন আমরা 'অতিরিক্ত' শব্দটি যোগ করে অতিরিক্ত সাদা স্রাব বলি তখনই এর সমস্যার কথা বোঝায়।

যোনিপথে অধিক পরিমাণে সাদা স্রাব যাওয়ার অবস্থাকে লিকোরিয়া বলে। এটি তেমন কোনো মারাত্মক সমস্যা নয়। এমনকি একজন নবজাত মেয়ে-শিশুর জন্মের ১ থেকে ২০ দিনের মধ্যে যোনিপথে এ সাদা স্রাব দেখা দিতে পারে এবং ২ থেকে ৪ দিনেই তা আবার ঠিক হয়ে যায়। এর জন্য ভয় পাবার বা চিকিৎসা করানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আবার বয়ঃসন্ধিকালে (প্রথম মাসিক শুরু হওয়ার সময়ে) এ স্রাব অতিরিক্ত দেখা দিতে পারে। এছাড়া মাসিক শুরুর কয়েকদিন আগে, ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাণু বের হওয়ার সময়, গর্ভকালীন সময়ে, যৌন উত্তেজনায় এবং জন্মনিরোধক বড়ি খাওয়ার কালে এ-স্রাব অধিক পরিমাণে দেখা দিতে পারে। আবার অনেক দিন ধরে কোনো অসুখে ভুগলে বা নানাবিধ দুশ্চিন্তার কারণেও শ্বেতপ্রদর দেখা দিতে পারে। আট-শাঁট আন্ডারওয়ার ব্যবহারে ও যৌনাঙ্গ পরিষ্কারের জন্য নানাবিধ তরল পদার্থ, বিশেষ করে সেগুলোয় পানি ব্যবহারের ফলেও এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

লিকোরিয়ার জটিলতা ও গুরুত্ব

লিকোরিয়া স্বাভাবিক স্রাবের একটা ধরন হওয়ায় এটি সন্তান উৎপাদনসহ প্রজননতন্ত্রের কার্যক্রমের উপর তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না। তবে সাময়িকভাবে পরিষ্কার-পরিপাটি দৈনন্দিন জীবনের ব্যাঘাত ঘটায়। লিকোরিয়া রোগিনীর গোপনাঙ্গে এক ধরনের অস্বস্তিকর ভেজা-অনুভূতির জন্ম দেয়। পরিধানের কাপড়ে অনেক সময় বাদামী রঙের দাগের সৃষ্টি করে। কখনো বা ভালভা'র চামড়া ছিলে যেতে পারে। আসল সমস্যা হলো : প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণে যে-স্রাব দেখা যায় তাকে লিকোরিয়ার স্রাব বলে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুবই প্রয়োজন, কারণ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের সঙ্গে বন্ধ্যাত্বসহ সন্তান উৎপাদনের নানা ধরনের সমস্যা ও মরণব্যাধি এইড্‌স-এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

লিকোরিয়া কিভাবে নির্ণয় করা হয়

লিকোরিয়া নির্ণয়ের জন্য রোগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও রোগিনীর শারীরিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। ইতিহাস নেয়ার সময়ে বিশেষ করে রোগিনীর বয়স, রোগ শুরুর প্রক্রিয়া, ঋতুচক্র ও বড়ি খাওয়ার ইতিহাস, গর্ভাবস্থায় ও যৌন জীবনের অবস্থার সাথে এ-স্রাবের সম্পর্ক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে

(৭ম পাতায় দেখুন)

জেনে রাখা ভাল

মশা নিধনকারী ওষুধে মশারী চুবানো (Bed net impregnation)

ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

ডেল্টামেথ্রিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় যার সংস্পর্শে আসলেই মশা মরে যায়, কিন্তু শুকনো অবস্থায় এ-অষুধের সংস্পর্শ মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়।

১ লিটার ডেল্টামেথ্রিন ৩০ লিটার পানিতে মিশিয়ে যে-দ্রবণ তৈরি হয় তাতে ১৪০টি সুতি কিংবা ৭০টি মিশ্র কিংবা ৩০টি নাইলনের মশারী চুবানো যায়। চুবানো মশারীগুলো নিংড়ানো চলবে না — দুই হাতে চেপে ধরে রাখতে হবে যাতে অতিরিক্ত দ্রবণ চুইয়ে বের হয়ে যায়। এরপর মশারীগুলো মাদুর বা চাটাইয়ের উপর বিছিয়ে ছায়ায় শুকাতে হবে। ভেজা অবস্থায় মশারী নিংড়ালে বা ঝুলিয়ে রাখলে এবং রোদে শুকালে অষুধের কার্যক্ষমতা নষ্ট নয়। ব্যবহৃত অতিরিক্ত অষুধ পানিতে ফেললে বা মাদুর, চাটাই, ইত্যাদি পুকুরে ধুলে পুকুরের মাছের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই এগুলো শুকনো মাটিতে বা গর্তের ভেতর ধোয়া উচিত।

অষুধে মশারী চুবানোর আগেই মশারীগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। অষুধ লাগানোর পর ৬-৯ মাসের মধ্যে আর ধোয়া যাবে না, কারণ মশারী ধুলে অষুধের কার্যকারিতা কমে যায়। রাতে মশারীগুলো ব্যবহারের পর দিনের বেলায়ও ঘরের কোণায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে, কারণ যতক্ষণ মশারী খোলা থাকে ততক্ষণই মশা এর সংস্পর্শে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। এতে এলাকায় মশার সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকবে ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে।

আইসিডিডিআর,বি-র চকোরিয়া কম্যুনিটি হেল্‌থ প্রজেক্টের আওতাধীন মাইজপাড়া, হিন্দুপাড়া ও ইসলামনগর নামক তিনটি গ্রামের জনগণ সংগঠিত হয়ে স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনের উদ্যোগে ও সরকারের সহায়তায় "ঔষধে মশারী চুবানো" কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়েছে। গত এক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে: ১২ মাস পরও ঐসব মশারীর সংস্পর্শে এসে মশা মরে যাচ্ছে এবং ঐসব এলাকার লোকজন আগের চেয়ে কম হারে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় আরও অনেক এলাকায় এ ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। তবে এই কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে নিয়মিত মশারী ব্যবহার এবং শুধু নিজে নয়, আশেপাশের সবাইকে মশারী ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করার ওপর।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান

সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ মহসীন আহমেদ, ডাঃ খালেকুজ্জামান, ডাঃ নাহরিনা দেওয়ান, এম.এ. রহীম ও শামীম আরা জাহান; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী;

প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬

টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে.; ই-মেইল : msik@cholera.bangla.net

মুদ্রণে ঃ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ